জাদু বিপণি

এইচ জি ওয়েলস

জাদু বিপণি

(The Magic Shop)

দূর থেকে বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম ম্যাজিকের দোকানটা। সামনে দিয়েও গেছি কয়েকবার। দেখেছি কাচের শোকেসে লোভনীয় জাদুসামগ্রী। ম্যাজিক বল, ম্যাজিক মুরগি, বিচিত্র শঙ্কু, হরবোলা পুতুল, ম্যাজিক ঝুড়ি, ম্যাজিক তাস। দেখেই গিয়েছি এই ধরনের হরেক রকমের জিনিস–ঢোকার ইচ্ছে হয়নি কখনও। কিন্তু না ঢুকে পারলাম না সেইদিন –যেদিন আমার আঙুল ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিপ টেনে নিয়ে গেল দোকানটার সামনে, একটার পর একটা জিনিস দেখাতে দেখাতে বুঝিয়ে দিলে, উপায় নেই, ঢুকতেই হবে ভেতরে। সত্যি কথা বলতে কী, দোকানটা যে রিজেন্ট স্ট্রিটেই আছে, তা-ও তো মাথায় আসেনি কখনও, রয়েছে মুরগির ছানা আর ছবির দোকানের ঠিক মাঝখানে। আমার কিন্তু বরাবরই মনে হয়েছে, এ দোকান যেন দেখেছি সার্কাসে, অথবা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মোড়ে, অথবা হলবর্নে। রাস্তার ওপরেই, কিন্তু ভেতরে ঢোকার পথটা কখনও পাওয়া যায়নি। মরীচিৎকার মতো দোকানের অবস্থান যেন ধাঁধা সৃষ্টি করে গেছে এতটা কাল। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওই তো সেই দোকান! জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনেই, বিস্তর জাদুসামগ্রী যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ভেতরে এসো! ভেতরে এসো! আঙুল তুলে একটার পর একটা জিনিস দেখতে দেখতে শেষকালে কাচের ওপর আঙুলের বাজনা পর্যন্ত শুনিয়ে দিলে জিপ।

ঠকঠক করে কাঁচে আঙুল ঠুকে একটা আজব ডিম দেখিয়েছিল, অদ্ভুত ক্ষমতা এই ডিমের, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে যখন-তখন। বলেছিল, জান বাবা, বড়লোক যদি হতাম, তাহলে আমিই কিনে ফেলতাম। আর ওই যে ওইটা দেখছ– ঠকঠক ঠকঠক শব্দে আঙুল ঠুকে এবার দেখিয়েছিল একটা কাঁদিয়ে শিশুকে, দেখতে অবিকল মানুষের শিশুর মতোই, পুতুল বলে মনেই হয় না, ওটাও কিনতাম। রহস্যময় এইসব ম্যাজিকের জিনিসপত্রের পাশে রাখা কার্ডটার দিকেও শেষ পর্যন্ত আঙুল তুলে দেখিয়েছিল জিপ। কার্ডে লেখা যে। কোনও একটা জিনিস কিনে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের মুন্ডুগুলো ঘুরিয়ে দাও।

জিপের মুখে তখন খই ফুটছে, ওই যে শব্দুগুলো দেখছ-না বাবা, ওর নিচে জিনিস রাখলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। বইতে পড়েছি। তারপরেই

আধ পেনিটা দেখেছ? ফুস করে মিলিয়ে যায় বাতাসে।

জিপ হয়েছে ওর মায়ের মতোই। শিক্ষাদীক্ষাই আলাদা। দোকানে ঢোকার নামও করেনি। আমাকে জ্বালিয়েও মারেনি। নিজের অজান্তেই কেবল আমার আঙুলটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে ভেতরে ঢোকবার দরজার সামনে। ইচ্ছেটা স্পষ্ট করে তুলেই শান্ত হয়েছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে একটা ম্যাজিক বোতলের দিকে। বড় হলে, অনেক টাকার মালিক হলে নাকি ওটাও কিনবে।

আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখুনি যদি কিনে ফেলিস, তাহলে কী করবি?

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল জিপের চোখ-মুখ, জেসিকে দেখাব।

দরজার হাতলে হাত রেখে আমি তখন বলেছিলাম, তোর জন্মদিনের তো এখনও একশো দিনেরও বেশি দেরি রে।

জবাব দেয়নি জিপ। আমার আঙুলের ওপর মুঠোর চাপটা কেবল বেড়েছিল। তাই ঢুকতেই হয়েছিল দোকানে।

দোকানটা মামুলি দোকান নয় মোটেই। ম্যাজিকের দোকান বলেই জিপ যেসব খেলা দেখলে আনন্দে নেচে উঠত, সেসব খেলা একটাও নেই। তা সত্ত্বেও বোবা মেরে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল আজব বস্তুগুলোর দিকে।

দোকানে আলোর বাড়াবাড়ি তেমন নেই পর্যাপ্ত আলোও নেই। ছোট্ট সংকীর্ণ ঘর। দরজা বন্ধ করে দিতেই দরজার ঘণ্টায় পিং পিং আওয়াজটা একনাগাড়ে বেজেই চলল পেছনে। কেউ নেই আশপাশে। বাপ-বেটায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কিম্ভুতকিমাকার জিনিসগুলো। কাউন্টারের তলার দিকে দেখলাম একটা কাঠের মণ্ড দিয়ে তৈরি গম্ভীরবদন শান্তচক্ষু বাঘ, নিয়মিত ছন্দে নেড়ে চলেছে বিরাট মাথা। দেখলাম বেশ কয়েকটা ক্রিস্টাল বর্তুল, ম্যাজিক তাস ধরে থাকা একটা চৈনিক হাত, বিভিন্ন আকার এবং আয়তনের বেশ কিছু ম্যাজিক মাছের স্ফটিক পাত্র, একটা কদাকার ম্যাজিক টুপি, ভেতরকার স্প্রিং পর্যন্ত চোখে পড়ছে। মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে ম্যাজিক আয়না, বেশ কয়েকটা। কোনওটায় প্রতিফলিত চেহারা লম্বা আর রোগাটে হয়, কোনওটায় হয় বেঁটে আর মোটা। দেখছি আর হাসছি দুজনে, এমন সময়ে দোকানে ঢুকল নিশ্চয় দোকানদার নিজেই।

ঢুকল, মানে কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু এমন আচমকা এসে দাঁড়াল সামনে যে মনে হল, ছোট্ট ওই দোকানঘরে এতক্ষণ তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। থাকলে দোকানে ঢুকেই কি তাকে দেখতে পেতাম না? ওইটুকু তো ঘর রে বাপু।

লোকটার চেহারা মনে রাখবার মতো। বিচিত্র বলতে যা বোঝায়, তা-ই। নোংরা। গায়ের রং কালচে। একটা কান আরেকটা কানের চেয়ে বেশি লম্বা। থুতনি তো নয়, যেন বুটজুতোর ডগা, মোটা চামড়ার টুপি পরানো।

কাউন্টারের ওপরকার কাচের বাক্সে লম্বা লম্বা দশখানা আঙুল মেলে ধরে, বললে সে আচমকা, বলুন কী দেখাব? ওই গলা শুনেই তো বুঝলাম, দোকানদার রয়েছে দোকানেই, কিন্তু এতক্ষণ তাকে দেখা যায়নি মোটেই।

খানকয়েক সোজা ধরনের ম্যাজিকের জিনিস চাই ছেলেটার জন্যে, বলেছিলাম আমি।

হাতসাফাইয়ের ম্যাজিক, না কলের ম্যাজিক? ঘরোয়া ম্যাজিক, না—

মজা পাওয়ার মতো যা হয় কিছু হলেই চলবে।

হু-উ-উম! বলে তো খচমচ করে মাথা চুলকে নিলে দোকানদার, যেন কত ভাবনাতেই না পড়েছে। তারপরেই চোখের সামনেই আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে থেকে টেনে বার করল কিনা একটা কাচের বল! নাকের ডগার সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে ভিজে ভিজে গলায়, এইরকম মজার জিনিস হলে চলবে কি?

তৈরি ছিলাম না এ ধরনের ম্যাজিকের জন্যে–যদিও হাতসাফাইয়ের এ ম্যাজিক আমি যে কতবার দেখেছি এর আগে, তার ঠিক নেই। সব ম্যাজিশিয়ানই রপ্ত করে এই ধরনের হস্তকৌশল, কিন্তু এ দোকানে কায়দাটা দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না মোটেই। অট্টহেসে তাই বলেছিলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ধরনের হলেই চলবে।

যন্ত্রচালিতের মতো স্ফটিক বর্তুলকে হস্তগত করার মানসে হাত বাড়িয়েই কিন্তু বোকা বনে গিয়েছিল জিপ বেচারি। কোথায় কাচের বল? হাত তো ফাঁকা!

মুচকি হেসে বলেছিল কিম্ভুত দোকানদার, পকেটে দেখ খোকা, পেয়ে যাবে।

সত্যিই তো! জিপের পকেট থেকে বেরল আশ্চর্য বলটা!

দাম কত? জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

বিনয়ের অবতার হয়ে তখুনি বলেছিল দোকানদার, আরে ছি ছি! কাচের বলের দাম আমরা নিই না, ওটা ফ্রি! পাচ্ছিও তো ফ্রি! বলতে বলতে আর-একখানা কাচের বল বার করেছিল নিজের কনুই থেকে। পরক্ষণেই তৃতীয় বলটাকে টেনে আনল কাঁধ থেকে। পাশাপাশি তিনটে বল সাজিয়ে রাখল কাচের কাউন্টারে। সীমাহীন শ্রদ্ধায় বলগুলোর দিকে জিপ তাকিয়ে আছে দেখে একগাল হেসে বলেছিল দোকানদার, নিয়ে যাও খোকা, এটাই বা বাদ যায় কেন? বলতে বলতে চতুর্থ বলটা টেনে বার করেছিল নিজের বদন গহ্বর থেকে।

চকিতে আমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নিলে জিপ চোখে চোখে, মুখে একটি কথাও না বলে। তারপর নিবিড় নৈঃশব্দ্যকে তিলমাত্র ব্যাহত না করে বল চারখানা সরিয়ে রাখল

একপাশে, ফের শক্ত করে চেপে ধরল আমার আঙুল এবং উদগ্রীব হয়ে রইল পরবর্তী ম্যাজিক দেখার জন্যে।

নৈঃশব্দ্য ভাঙল দোকানদার নিজেই। বললে, ছোটখাটো কায়দা-টায়দাগুলো দেখাই এইভাবেই।

হাসলাম। যেন ঠাট্টা শুনে মজা পেয়েছি, এইরকম একখানা ভাব করলাম।

বললাম, পাইকারি দোকানের চাইতে সস্তাও বটে।

একরকম তা-ই বটে। শেষমেশ দাম কিন্তু দিতেই হয়। তবে আগুন-দাম নয়, অনেকের যা ধারণা... বড়সড়ো ম্যাজিক, রোজকার খাবারদাবার আর অন্যান্য যা কিছু দরকার, সবই পাই ওই টুপির ভেতর থেকে... খাঁটি ম্যাজিকের দোকান বলতে যা বোঝায়, সেরকম দোকান অবশ্য কোথাও পাবেন না, পাইকারি দোকান তো নেই-ই... ঢাকবার সময়ে খেয়াল করেননি বোধহয় সাইনবোর্ডে লেখা আছে, খাঁটি ম্যাজিকের জিনিস পাবেন এখানে। বলতে বলতে একটা বিজনেস কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিল দোকানদার, এক্কেবারে খাঁটি জিনিস, স্যার, লোক ঠকানোর কারবার এখানে হয় না।

আহা, রগুড়ে লোক তো! রঙ্গরসিকতায় বিলক্ষণ পোক্ত।

জিপের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অমায়িক হাসি হাসল লোকটা, মূর্তিমান শিষ্টাচার বললেই চলে। বললে, খোকা, বড় ভালো ছেলে তুমি।

জিপ যে সত্যিই ভালো ছেলে, এ তথ্যটাও লোকটা জেনে বসে আছে দেখে অবাক হয়েছিলাম বিলক্ষণ। বাড়িতেও ব্যাপারটা গোপন রেখেছি নিছক নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে। জিপের কানে যেন না যায়। কিন্তু এ লোকটা...।

জিপ কিন্তু তিলমাত্র সপ্রতিভ হল না। উচ্ছ্বাস প্রকাশও করল না। নিরেট নীরবতায় ঢেকে রেখে দিল নিজেকে। পলকহীন চক্ষু নিবদ্ধ রইল অদ্ভুত দোকানের বিচিত্র দোকানদারের ওপর।

ভালো ছেলেরাই শুধু এ দোকানের চৌকাঠ পেরতে পারে–আর কেউ না।

কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, তার উদাহরণস্বরূপ সহসা দোকানের বাইরে ছিচকাঁদুনে বায়না শুনলাম বালক-কণ্ঠে। ঘ্যানঘ্যান করছে বাবার কাছে। অচিরেই দেখা গেল তাকে কাচের মধ্যে দিয়ে। চকোলেট খাওয়া গোবদা চেহারা, নিরক্ত সাদাটে মুখ, চাই-চাই ভাব চোখে-মুখে–নিজের কথা ছাড়া যেন দুনিয়ায় আর কারও কথা ভাবে না। বাবা বেচারি সামলাতে পারছে না ছোঁড়াটাকে। তিতিবিরক্ত হয়ে বলছে, এডওয়ার্ড, দোকান তো দেখছি বন্ধ।

সে কী, দরজা তো খোলাই রয়েছে, বলেছিলাম আমি।

না, বন্ধ রয়েছে, নির্বিকারভাবে বলেছিল দোকানদার।

কর্ণপাত না করে নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলাম দরজা খুলে দিতে। কিন্তু পারিনি। দরজা সত্যিই বন্ধ রয়েছে। খোলে কার সাধ্যি। নাছোড়বান্দা ছিচকাঁদুনে ছোঁড়াটাকে টানতে টানতে

বিব্রত বাবা সরে যেতেই কাউন্টারে এসে বলেছিলাম, আশ্চর্য তো! দরজা বন্ধ হয়ে গেল কীভাবে?

ম্যাজিকের জোরে! বলেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে যেন উড়িয়ে দিয়েছিল জাদুকর দোকানদার। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল আমার! কেননা, আঙুলের ডগা থেকে নিঃশব্দে ছিটকে গিয়েছিল অনেকগুলো রংবেরঙের তারা। ঠিক যেন রংমশাল! তারাবাজির খেলা! ঝলমলে তারাগুলো ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গিয়েছিল কোণের অন্ধকারে।

আমি তো হতভম্ব। কিন্তু দোকানদারের ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। জিপের দিকে তাকিয়ে বলেছিল আপন-করে-নেওয়া সুরে–খোকা, দোকানে ঢোকবার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে বলছিলে-না, বন্ধুবান্ধবদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার ম্যাজিক কিনবে বড় হয়ে?

বলছিলামই তো।

পকেটেই পেয়ে যাবে।

বলেই, কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিপের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিশিয়ানদের মামুলি কায়দায় ম্যাজিক বাক্স বার করে এনেছিল অদ্ভুত মানুষটা। তখনই লক্ষ করেছিলাম আশ্চর্য রকমের ঢেঙা তার আকৃতি। মানুষ যে এমন গাছের মতো লম্বা হতে পারে, জানা ছিল না। কাউন্টারের ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকার সময়েও বুঝতে পারিনি। পুরো কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল হিলহিলে লম্বা দেহটা!

চক্ষুস্থির হতে তখনও বাকি আমার। ম্যাজিক বাক্স টেনে বার করেই শূন্যকে লক্ষ্য করে হাঁক দিয়েছিল সৃষ্টিছাড়া দোকানদার, কাগজ। বলেই, স্প্রিং বার-করা টুপিটার ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল একটা প্যাকিং কাগজ। দড়ি, বলতেই, দেখি, দড়ির বাক্স হয়ে গিয়েছে দোকানদারের মুখবিবর। টানছে তো টানছেই–দড়ি যেন আর ফুরাচ্ছে না। বাক্স বাঁধা হয়ে যেতেই দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে দিলে এবং বেশ মনে হল যেন কোঁত করে গিলেই ফেলল দড়ির বাক্স। তারপরেই একটা মোমবাতি ধরল একটা হরবোলা ডামি পুতুলের নাকের ডগায়। পিলে চমকে উঠেছিল দপ করে মোমবাতির শিখা ধরে ওঠায়। তারপরেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল যখন দেখলাম, নিজের একটা আঙুল নির্বিকারভাবে মোমবাতির শিখায় পোড়াচ্ছে দোকানদার! সর্বনাশ! এ তো আঙুল নয়–গালা! লাল গালা! গালা গলে গিয়ে টপটপ করে পড়ছে দড়ির গিঁটের ওপর। প্যাকেট সিল করে দিয়েই জিপকে বলেছিল আজব দোকানদার, এবার তো চাই অদৃশ্য-হওয়া ডিম, তা-ই না? কথাটা বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে খপ করে আমার বুকপকেট থেকে একটা ডিম বার করে প্যাক করে ফেলেছিল কাগজে। এরপরেই আবির্ভূত হল কাঁদুনে বাচ্চা–সেটাও বেরল আমারই কোটের ভেতরের পকেট থেকে। প্রতিটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছিলাম জিপের হাতে। একটা কথাও না বলে প্যাকেটগুলো আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা আমার মতো এমনভাবে আকাশ থেকে পড়ার ভাব দেখায়নি আঁতকে ওঠার মতো অত ম্যাজিক দেখেও। চোখ দুটোতেই অবশ্য ফুটে উঠেছিল মনের কথা–ম্যাজিক! ম্যাজিক! এই হল গিয়ে খাঁটি ম্যাজিক!

আচমকা ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। নরম নরম কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মাথার ওপর টুপির মধ্যে? টুকুস টুকুস করে লাফ দিচ্ছে তো দিচ্ছেই?

ধাঁ করে টুপি খুলতেই ফরফর করে উড়ে নেমে এসেছিল একটা পায়রা-খড়মড় করে ঢুকে গিয়েছিল কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি বাঘটার পাশে রাখা কার্ডবোর্ড বাক্সের মধ্যে। ছি ছি ছি! বলতে বলতে মহা আড়ম্বরে টুপিখানা নিজের হাতে নিয়েছিল দোকানদার, কাণ্ডজ্ঞান দেখেছেন? ডিম পাড়বার আর জায়গা পেল না!

আরে সর্বনাশ! টুপি ঝাড়তেই যে খান তিনেক ডিম বেরিয়ে এল দোকানদারের হাতের চেটোয়। তার পরেও বেরল একটা মার্বেল গুলি, একটা ঘড়ি, আধ ডজন সেই কাচের বল আর দোমড়ানো কাগজের ডেলা। শেষোক্ত বস্তুটার যেন শেষ নেই। বেরচ্ছে তো বেরচ্ছেই। পর্বতপ্রমাণ কাগজের স্তূপের আড়ালে শেষ পর্যন্ত দোকানদারকে আর দেখতেও পেলাম না। বকবকানিই কেবল শুনে গেলাম। কী আশ্চর্য! টুপির মধ্যে এত জিনিস! তাহলেই দেখুন, ইচ্ছে করলে কত কী-ই না লুকিয়ে রাখা যায় জামা-প্যান্ট-টুপির মধ্যে... আরে... আরে... শেষ কি নেই!

আচমকা স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর। যেন গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে পিন ঠিকরে গেল ইটের ঠোক্করে।

আর কোনও কথা নেই।

কাগজের খসখসানিও নেই।

থমথমে নীরবতা।

টুপির কাজ শেষ হল? জানতে চেয়েছিলাম গলাখাঁকারি দিয়ে। জবাব নেই।

www.bengaliebook.com

দৃষ্টিবিনিময় করেছিলাম আমি আর জিপ। বিদঘুটে আয়নাগুলোয় দেখেছিলাম বাপ বেটার বিদঘুটে প্রতিবিম্ব–দুজনেরই চোখ বড় বড়।

জিপ কিন্তু রীতিমতো গম্ভীর। শান্ত। নির্বিকার।

হেঁকে বলেছিলাম আমি, এবার যাওয়া যাক। ও মশাই, দাম কত হল?

সাড়া নেই।

গলা চড়িয়েছিলাম, দয়া করে ক্যাশ মেমোটা এবার দিন।

তাচ্ছিল্যের নাসিকাধ্বনি যেন শুনলাম কাগজের ডাঁইয়ের আড়ালে?

জিপকে বলেছিলাম, চল তো দেখি কাউন্টারের ওদিকে–নিশ্চয় লুকিয়ে আছে–মজা করছে।

বাঘটা কিন্তু সমানে মাথা দুলিয়েই যাচ্ছিল এত কাণ্ডের মধ্যে। তার পাশ দিয়ে গেলাম কাউন্টারের ভেতরে। কী দেখলাম জানেন? কাউকে না! মেঝের ওপর কেবল পড়ে রয়েছে আমার টুপিটা। পাশেই বসে একটা খরগোশ। ম্যাজিশিয়ানদের খরগোশদের মতোই বোকা-বোকা চেহারা। কিন্তু ভাবখানা যেন বড় কঠিন সমস্যায় পড়েছে–ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না। আমি টুপি তুলে নিতেই তিন লাফ মেরে চলে গেল চোখের বাইরে।

বাবা! ফিসফিস করে বলেছিল জিপ।

কী রে?

কী সুন্দর দোকান বাবা, খু-উ-উ-ব ভালো লাগছে।

ভালো তো আমারও লাগছে রে। মনে মনেই বলেছিলাম আমি, আরও ভালো লাগত, যদি কাউন্টারটা হঠাৎ নিজে থেকেই লম্বা হয়ে না গিয়ে দরজার পাল্লাটা এঁটে ধরত। মুখে কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করলাম না, পাছে জিপের নজর সেদিকে গিয়ে পড়ে। অদ্ভুত কাণ্ডটা ওর না দেখাই ভালো।

জিপের নজর তখন অবশ্য খরগোশটার দিকে। লাফাতে লাফাতে পাশ দিয়ে সরে পড়বার মতলবে রয়েছে। জিপ কি অত সহজে ছাড়ে? আদুরে গলায় বললে, এই পুসি, জিপকে একটা ম্যাজিক দেখাবি না? পুসির বয়ে গেছে ম্যাজিক দেখাতে! টুকুস টুকুস করে লাফ দিয়ে সুড়ত করে গলে গেল পাশের একটা দরজা দিয়ে।

অবাক কাণ্ড! এ দরজা তো একটু আগেও চোখে পড়েনি আমার! হলফ করে বলতে পারি, ছোট্ট ঘরখানায় এ দরজা ছিল না। এল কোত্থেকে?

আচমকা ঈষৎ ফাঁক হয়ে-থাকা পাল্লাটা খুলে গেল দুহাট হয়ে–নিঃশব্দে বিটকেল হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল দোকানদার স্বয়ং–যার একটা কান আর-একটা কানের চেয়ে। বেশি লম্বা। হাসিটা দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল আমার। কেননা, এ হাসি নিছক আমুদে হাসি নয়, সেই সঙ্গে মিশে আছে যেন একটু বেপরোয়া ভাব–যেন আমাকে তোয়াক্কা না করার ভাব–ম্যাজিক জিনিসটার প্রতি আমার অবিশ্বাসী মনোভাবটাকে যেন নস্যাৎ করার মনোভাব। বিচ্ছিরি হাসিটা ঠোঁটের কোণে বিচ্ছিরিভাবে দুলিয়ে রেখেই বলেছিল রহস্যময় জাদুকর, স্যার, শোরুমটা দেখতে চান তো? এমন মসৃণভাবে প্রস্তাবটা রাখল সামনে যেন

ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। আঙুলের ওপর জিপের টান অনুভব করলাম– হঠাৎ-আবির্ভূত দরজার দিকে টানছে আমাকে। দৃষ্টি ফেরালাম ভূতুড়ে কাউন্টারটার দিকে পরক্ষণেই চোখাচোখি হয়ে গেল দোকানদারের সঙ্গে। ম্যাজিক জিনিসটা ততক্ষণই মজাদার থাকে, যতক্ষণ তা খাঁটি জাদুবিদ্যা না হয়ে যায়। এখানে যেন বড় বেশি অলৌকিক খেলা দেখে ফেলছি। গা শিরশির করছিল সেই কারণেই। তাই বলেছিলাম, হাতে বেশি সময় নেই। কিন্তু মুখের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দেখি, কীভাবে জানি না, চৌকাঠ পেরিয়ে পৌঁছে গেছি শোরুমের মধ্যে।

আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করতে করতে দোকানদার তখন পরম আয়েশে ঘষছে নিজের দুহাত। হাত তো নয়, যেন রবার দিয়ে তৈরি।

আঙুল-টাঙুলগুলোয় গাঁট-ফাঁটের বালাই নেই বললেই চলে। কথা বলছে যেন মিছরির রসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, বিলকুল খাঁটি ম্যাজিকের জিনিসপত্র, স্যার–নকলি মাল এখানে একটাও নেই।

হারামজাদা! মনে মনেই বলেছিলাম আমি। কিন্তু মুখে তা ব্যক্ত করা সমীচীন নয়। ওই জাতীয় কোনও শব্দ মুখ দিয়ে বার করার আগেই অবশ্য কোটের হাতা ধরে কে যেন টানাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল। চোখ নামিয়েই দেখেছিলাম, একটা লেজওয়ালা লাল রঙের বিটলে বামন-দৈত্য টানাটানি করছে আমার কোটের হাতা ধরে! দোকানদার ধরে রয়েছে তার লম্বা লেজটা। টেনে নিয়ে আনতে চাইছে নিজের দিকে, বিটলে দৈত্যের মহা আপত্তি তাতে–কামড়ে দিতে যাচ্ছে দোকানদারের হাত। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ বা ভয়ডর নেই। আশ্চর্য দোকানদারের। চোখের পলক ফেলার আগে অদ্ভুত কায়দায় লেজ ধরে লাল

দৈত্যকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কাউন্টারের পেছনে–খুব স্বাভাবিকভাবেই অবশ্য। মুখের চামড়ায় সামান্যতম বিকৃতি বা কুঞ্চন দেখা গেল না–যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার অবস্থা কিন্তু তখন শোচনীয়।

নিশ্চয় রবারের তৈরি দৈত্য। নাড়ালেই কিলবিল করে উঠেছে–চকিত দেখায় মনে হয়েছে জ্যান্ত দৈত্য। চক্ষুভ্রম সৃষ্টি করাই তো জাদুকরের মুনশিয়ানা। মনকে এইভাবে প্রবোধ দিলেও কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকেছিল গলার কাছে!

ঢোক গিলে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম লাল দৈত্যের অন্তর্ধান ঘটতেই। লোকটার হাবভাব মোটেই ভালো লাগেনি। এই ধরনের কুৎসিত কদাকার গা-ঘিনঘিনে নচ্ছার প্রাণীদের ঘাঁটাঘাঁটি যারা করে, তাদের দেখলেই যেমন গা শিরশির করে ওঠে, আমার সারা গা তখন শিরশির করছে ঠিক সেইভাবে। তাকিয়েছিলাম জিপের দিকে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম ওর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা দেখে। একদৃষ্টে দেখছে একটা ম্যাজিক ঘোড়া, দুলন্ত ঘোড়া। বিতিকিচ্ছিরি দৈত্যটাকে চোখে পড়েনি জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। চোখের ইঙ্গিতে জিপকে দেখিয়ে আর অন্তর্হিত লাল দৈত্যের দিকে ইশারা করে খাটো গলায় বলেছিলাম দোকানদারকে, আশা করি এই ধরনের সৃষ্টিছাড়া জিনিস আর নেই আপনার হেপাজতে?

আরও রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল পাজির পা-ঝাড়া দোকানদারের চোখে-মুখে। খাটো গলাতেই বলেছিল বিষম বিস্ময় প্রকাশ করে, সে কী! ও জিনিস তো এ দোকানের নয়!

বাইরে থেকে এসে পড়েছে–আপনিই এনেছেন হয়তো জামা-প্যান্টের মধ্যে। পরের কথাটা নিক্ষিপ্ত হল জিপের উদ্দেশে, খোকা, মনের মতো আর কী দেখতে চাও বল দিকি?

অনেক কিছুই তো দেখতে চায় জিপ–এ দোকানের সবই তো দেখছি ওর মনের মতোই। প্রশ্নটা শুনেই সসম্ভমে তাকিয়েছিল নচ্ছার দোকানদারের দিকে–দুচোখে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম ম্যাজিকের ব্যাপারে লোকটার ওপর অপরিসীম আস্থা। বলেছিল সশ্রদ্ধ সুরে, ওটা কি ম্যাজিক তলোয়ার?

খেলনা ম্যাজিক তলোয়ার। বাঁকে না, ভাঙে না, আঙুল কেটেও যায় না। এ তলোয়ার যার কাছে থাকে, আঠারো বছরের নিচে যে কোনও শত্রুকে সে হারিয়ে দিতে পারে তলোয়ার যুদ্ধে। যেমন সাইজ, তেমন দাম। আধ ক্রাউন থেকে সাড়ে সাত পেনি পর্যন্ত। আর এই যে কার্ডের তৈরি ফুল সেট বর্ম দেখছ, এগুলো বাচ্চা নাইট-যোদ্ধাদের খুবই দরকার। এই ঢাল নিয়ে তলোয়ার যুদ্ধে নামলে শত্রুর তলোয়ার গায়ে লাগবে না, এই চটি পায়ে গলালে বিদ্যুৎবেগে শত্রুকে হারিয়ে দেবে, এই শিরস্ত্রাণ মাথায় পরলে কার সাধ্যি তোমার মাথায় তলোয়ারের কোপ মারে।

শুনে যেন দম আটকে এল জিপের–বাবা!

অর্থাৎ এমন জিনিস না কিনলেই নয়। দাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু আমার কোনও কথাতেই কান দেয়নি দোকানদার। জিপকে বেশ কবজায় এনে ফেলেছে ততক্ষণে; জিপ আমার আঙুল ছেড়ে তার আঙুল খামচে ধরে শোরুম ভরতি অজস্র বিদঘুটে জিনিসপত্রের আশপাশ দিয়ে দিব্যি ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। জিপকে ফেরানোর সাধ্যি তখন আমারও নেই। দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল আমার। একটু ঈর্ষাও হয়েছিল। জিপ এত সহজে

আমার আঙুল ছেড়ে আর-একজনের আঙুল ধরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াবে, ভাবতেও পারিনি। লোকটার অনেক গুণ আছে মানছি, ছেলেপুলে তো বটেই, তাদের বাবাদের মনেও চমক সৃষ্টি করতে পারে, চক্ষু চড়কগাছ করে দেওয়ার মতো নকল সামগ্রীও বানাতে ওস্তাদ, তা-ও মানছি, তবুও

কথা না বাড়িয়ে অগত্যা ওদের পেছনেই লেগে ছিলাম আঠার মতো। বিশেষ করে নজর রেখেছিলাম হাতসাফাইয়ের জাদুকরটার ওপর। জিপ আনন্দ পাচ্ছে, এটাই বড় কথা। সময় হলেই বাপ-বেটায় বেরিয়ে পড়ব দোকানের বাইরে।

শেষ নেই যেন শোরুমের। টানা লম্বা প্রদর্শনী মঞ্চের পর প্রদর্শনী মঞ্চ। জাদুসামগ্রীর বীথি বলা যায়। ম্যাজিক গ্যালারি, থাম, তাক আর কাউন্টার যেন আর ফুরাচ্ছে না। একটা খিলেন শেষ হয় তো আরম্ভ হয় আর-একটা। একটা ডিপার্টমেন্টের শেষে পৌঁছাতেই দেখি ধনুকাকৃতি নতুন ভিলেনের তলায় আর-একটা ডিপার্টমেন্ট। অদ্ভুত বিটকেল কিম্ভুতকিমাকার সহকারীরা প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে থাম, তাক আর কাউন্টারের আড়াল থেকে। এরকম কিম্ভুতদর্শন সহকারীর দল জীবনে দেখিনি মশায়। সারি সারি বিচিত্র দর্পণে নিজের রকমারি প্রতিবিম্ব দেখছি আর চমকে চমকে উঠছি। পরদার বাহারই বা কতরকম। ধাঁধা সৃষ্টি করে চলেছে বিরামবিহীনভাবে। চোখের ধাঁধা থেকে মনের ধাঁধা। শেষ পর্যন্ত পরদা আর আয়নার গোলকধাঁধায় বনবন করে মাথা ঘুরতে লাগল আমার। কোন দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম আশ্চর্য এই শোরুমের ভেতরে, কোনদিকে যে তা আছে, সে হিসেবও হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জিপকে ম্যাজিক ট্রেন দেখিয়েছিল দোকানদার। ম্যাজিকই বটে। বাষ্পে চলে না সে ট্রেন, ঘড়িযন্ত্রের মতো দম দেওয়ার কারবারও নেই। সিগন্যালগুলো যেখানে যা দরকার, কেবল বসিয়ে দিলেই হল, কু-ঝিকঝিক করে গড়িয়ে চলবে জাদু রেলগাড়ি। তারপরেই জিপকে দেখানো হল ভীষণ দামি বাক্স ভরতি সৈনিক। জ্যান্ত সৈন্যরা গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে আসবে বাইরে ডালাটা খুলে ধরে একটা দাঁত-ভাঙা মন্ত্র বললেই। একবার শুনেই সে মন্ত্র মনে রাখার মতো কান আমার নেই। কিন্তু জিপ পেয়েছে ওর মায়ের মতো ধারালো কান। নিমেষে আওড়ে গেল ভজকট মন্ত্রটা। পিঠ চাপড়ে দিয়ে দোকানদার সৈন্যদের দুমদাম করে ছুঁড়ে ঢুকিয়ে দিলে বাক্সের মধ্যে এবং গোটা বাক্সটা তুলে দিলে জিপের হাতে। খোকা, এবার তোমার পালা। জাগাও সৈন্যদের, দোকানদারের মুখ থেকে কথাটা খসতে না-খসতেই মন্ত্র আওড়ে জ্যান্ত সৈন্যদের বাক্সের বাইরে বার করে এনেছিল জিপ।

নেবে নাকি? দোকানদারের প্রশ্ন।

জবাবটা দিয়েছিলাম আমি, নেব বইকী, কিন্তু পুরো দাম নিতে হবে আপনাকে। চুম্বকটাও দিয়ে দেবেন সেই সঙ্গে

কী যে বলেন! বলেই দুমদাম করে সৈন্যদের আবার বাক্সের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে ডালা বন্ধ করে গোটা বাক্সটাকে শূন্যে দুলিয়ে নিতেই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল আমার। শূন্যপথেই বাদামি কাগজে প্যাকিং হয়ে গেছে বাক্স, সুতো দিয়ে বাঁধাও হয়ে গেছে, এমনকী লেবেলের ওপর জিপের পুরো নাম-ঠিকানা পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে!

আমার ছানাবড়া চক্ষু দেখে সে কী হাসি দোকানদারের।

বলেছিল হাসতে হাসতেই, খাঁটি ম্যাজিক, স্যার। ভেজালের কারবার নেই এ দোকানে।

বিড়বিড় করে বলেছিলাম, এত খাঁটি ম্যাজিক আমার রুচিতে সয় না।

কথাটা বললাম যাকে লক্ষ্য করে, সে কিন্তু ততক্ষণে জিপকে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ম্যাজিকের কায়দা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রতিটা ম্যাজিকই অদ্ভুত, তার চাইতেও অদ্ভুত হাতসাফাইয়ের কায়দা। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে দোকানদার, গাম্ভীরি চালে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছে জিপ।

যতখানি সম্ভব এড়িয়ে চলছিলাম। কিন্তু কানে ছিপি দিয়ে তো থাকা যায় না। ম্যাজিক দোকানদার যখন যে জাদু-শব্দ উচ্চারণ করছে, চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে হুবহু সেই ঢঙে সেই উচ্চারণে তার পুনরাবৃত্তি শুনছি কচি গলায়! কান সেদিকে থাকলেও মন সরে গিয়েছিল অন্যদিকে। শোরুমের বিশালতা এবং মজাদার পরিবেশ সম্বন্ধে আগেই বলেছি। মজা এখানে সর্বত্র। এমনকী কড়িকাঠ, মেঝে, পরদাগুলোতেও। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা চেয়ারগুলোর মধ্যেও রয়েছে মজা, শুধুই মজা। কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছিল, যখনই চেয়ারের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেছি, তখনই যেন চেয়ারগুলো আপনা থেকেই নড়েচড়ে জায়গা বদল করে নিচ্ছিল। নিঃশব্দে চলেছে এই খেলা আমার দুপাশে, আমার পেছনে। সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিন্তু আর কোনও চেয়ারকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিনি। এ ধরনের অদ্ভুত মজা মোটেই ভালো লাগেনি আমার। ঘরের ওপরকার কার্নিশে দেখেছিলাম এমন একটা কিলবিলে সর্পিল নকশা, যা আমার রুচি মেনে নিতে পারেনি কোনওমতেই। তার চাইতে বিদঘুটে, সর্পিল হল, কার্নিশ থেকে ঝোলানো

সারি সারি কিম্ভুতকিমাকার মুখোশগুলো–নিছক প্লাস্টারে কি অমন ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব?

আচমকা আকৃষ্ট হয়েছিলাম অদ্ভুতদর্শন এক সহকারীর বিটকেল কার্যকলাপ দেখে। স্তূপাকার খেলনার আড়ালে থাকায় সে নিশ্চয় দেখেনি আমাকে, আমি দেখতে পেয়েছিলাম তার শরীরের তিন-চতুর্থাংশ। একটা থামে হেলান দিয়ে অলসভাবে খেলা করছিল নিজের নাকখানাকে নিয়ে অত্যন্ত বীভৎসভাবে! নেই কাজ তো খই ভাজ ভাব নিয়ে সময় কাটানো ঢঙে নিজের গোদা মোটকা নাকখানাকে হঠাৎ দূরবিনের মতো লম্বা করে ফেলেও ক্ষান্ত হয়নি। আরও মজা করার জন্যে ক্রমশ সরু করে ফেলেছিল নাকের ডগা। দেখতে দেখতে লাল রঙে ছোপানো চাবুকের মতো ইয়া লম্বা একখানা নাক সপাং সপাং করে বাতাস আছড়ে গিয়েছিল নিজের খেয়ালে। অতি বড় দুঃস্বপ্নেও যে এমন দৃশ্য দেখা যায়। না! থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চাবুকের মতো হাঁকড়ে চলেছে হিলহিলে লম্বা নাক। কী ভয়ানক! কী ভয়ানক!

দেখেই তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল আমার। এস্তে তাকিয়েছিলাম জিপের দিকে–ভয়ানক এই অবসর বিনোদন যেন সে বেচারির চোখে না পড়ে। দেখলাম, একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে ষড়যন্ত্রকারীর মতো সে ফিসফিস করে কথা বলছে। দোকানদারের সঙ্গে। দোকানদারও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হাতে একটা পেল্লায় ড্রাম।

চোখাচোখি হতেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছিল জিপ, লুকোচুরি খেলা, বাবা! লুকোচুরি খেলা!

বাধা দেওয়ার আগেই মাথার ওপর দিয়ে ড্রামখানা গলিয়ে দিয়েছিল দোকানদার।

সঙ্গে সঙ্গে দাবড়ানি দিয়েছিলাম তারস্বরে, ও কী হচ্ছে? ভয় দেখাচ্ছেন কেন ছেলেটাকে? তুলুন—এখুনি তুলুন!

দ্বিরুক্তি না করে অসম কর্ণের দোকানদার তুলে নিয়েছিল ড্রাম—ঘুরিয়ে ধরেছিল আমার দিকে। শূন্য ড্রাম। টুলও শূন্য! মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেছে আমার পুত্র!...

অদৃশ্যলোক থেকে অশুভশক্তি যদি হাত বাড়িয়ে কারও হৃৎপিণ্ড খামচে ধরে অকস্মাৎ, তখন তার মনের যা অবস্থা হয়—আমারও হল তা-ই। নিজস্ব সত্তা বলে যেন আর কিছুই রইল না। কাঠ হয়ে গেলাম। ধড়ফড় করতেও ভুলে গেলাম। রাগ বা ভয় কোনও বোধশক্তিই আর রইল না।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দেঁতো হাসি-হাসা দোকানদারের সামনে গিয়ে লাথি মেরে সরিয়ে দিলাম টুলখানা।

বললাম দাঁতে দাঁত পিষে, কোথায় গেল আমার ছেলে?

দুহাতে শূন্য ড্রামখানা আমার দিকে ফিরিয়ে বললে সে, দেখতেই পাচ্ছেন, লোক ঠকানো কারবার আমরা করি না—

হাত বাড়িয়েছিলাম কাঁধখানা খামচে ধরব বলে। কিন্তু সাঁত করে পিছলে গেল সে নাগালের বাইরে। আবার তেড়ে গেলাম কাঁধ খামচানোর জন্যে। বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে গিয়ে সে একটা দরজা খুলে ধরল সটকান দেওয়ার মতলবে। চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠেছিলাম

পেছন থেকে, দাঁড়ান... দাঁড়ান বলছি! বলেই ক্ষিপ্তের মতো ধেয়ে গিয়েছিলাম তাকে ধরতে গিয়ে পড়লাম নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে।

ধপ করে একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। কে যেন সশব্দে আছড়ে পড়েছে আমার গায়ের ওপর।

বিমূঢ় অবস্থায় শুনেছিলাম তার ক্ষমা প্রার্থনা–মাপ করবেন। দেখতে পাইনি।

দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছি রিজেন্ট স্ট্রিটে। ধাক্কা লেগেছে একজন ভদ্রবেশী শ্রমিকের সঙ্গে। গজখানেক দূরে হতচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে জিপ। আমাকে দেখেই কাষ্ঠ হেসে এসে দাঁড়াল পাশে।

বগলে রয়েছে চারখানা প্যাকেট!

ঝকঝকে হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে মুঠোয় চেপে ধরেছিল আমার একখানা আঙুল। ফ্যালফ্যাল করে আমি কিন্তু তখন ইতিউতি চেয়ে দেখছি। কই, ম্যাজিক দোকানের দরজা তো দেখা যাচ্ছে না! দোকানের চিহ্নও তো কোথাও নেই! ছবির দোকানটা আছে, মুরগিছানার দোকানটা কাছে–ম্যাজিকের দোকানটা গেল কোথায়?

মাথার মধ্যে এইরকম লন্ডভন্ড অবস্থায় একটাই করণীয় ছিল–ফুটপাতের কিনারায় গিয়ে ছাতা তুলে হাঁক দিলাম একটা ছ্যাকড়া গাড়িকে। জিপকে ধরে তুলে দিলাম গাড়ির মধ্যে। অতি কষ্টে মনে করলাম নিজের বাড়ির ঠিকানা, তারপর উঠে বসলাম জিপের পাশে।

কোটের পকেটে কী যেন একটা ঠেলে রয়েছে দেখে হাত ঢোকাতেই পেলাম একটা কাচের বল। টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম রাস্তায়।

জিপ শুধু দেখল, কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ কেউ কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারিনি।

তারপর জিপ বলেছিল বিষম উচ্ছ্বাসে, বাবা, দোকান বটে–খাঁটি ম্যাজিক!

ধুত্তোর ম্যাজিক! ছেলেটার গায়ে আঁচড় লেগেছে কি না, মনটা ঠিকঠাক আছে কি না, আগে তো সেইটা দেখি। সন্ধানী চোখে দেখেও গোলমাল কোথাও দেখলাম না। ছেলে আমার ঠিকই আছে, বরং বেশ ফুর্তিতেই আছে–বৈকালিক প্রমোদ উপভোগ করেছে মনপ্রাণ দিয়ে। বগলে রয়েছে চার-চারখানা প্যাকেট।

কিন্তু কী আছে প্যাকেটের মধ্যে?

মুখে বলেছিলাম, ছোটদের রোজ রোজ যেতে নেই এ ধরনের দোকানে।

চুপ করে রইল জিপ। নিরুচ্ছ্বাস, নিরুত্তাপ। যা ওর স্বভাব। হু-হুঁ করে উঠেছিল মনটা। সেই মুহূর্তে ওর মা যা করত, আমিও তা-ই করেছিলাম। হঠাৎ হেঁট হয়ে চুমু খেয়েছিলাম ওর কপালে। হাজার হোক, ছেলেটা তো মজা পেয়েছে, আমি না-ই বা পেলাম!

প্যাকেটগুলো পরে খোলার পর আশ্বস্ত হয়েছিলাম পুরোপুরি। তিনটে বাক্সের মধ্যে সিসের সৈন্য। মামুলি খেলনা। কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে। এত সুন্দর যে, জ্যান্ত সৈন্য না পাওয়ার

দুঃখ ভুলে গিয়েছিল জিপ। চতুর্থ বাক্সটায় ছিল কিন্তু একটা জ্যান্ত বেড়ালছানা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি খিদে। মেজাজি নয় মোটেই।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম প্যাকেট চারটের জিনিসপত্র দেখে। তারপরেও অবশ্য মন না চাইলেও আপনা থেকেই পা চলে যেত ওর খেলাঘরের দিকে, ঘুরঘুর করতাম আশপাশে...

এ ঘটনা ঘটেছিল ছমাস আগে। এই ছমাসের মধ্যে উদ্ভট কিছু না ঘটায় মনের মধ্যে আর কোনও অস্বস্তি বোধ করিনি। সব বেড়ালছানার মধ্যে অল্পবিস্তর ম্যাজিক থাকে, ব্যতিক্রম দেখিনি এই বেড়ালছানার ক্ষেত্রেও। ম্যাজিকের নামগন্ধ পাইনি তিন বাক্স সিসের সৈন্যদের মধ্যে। খেলনা হিসেবে অতুলনীয়।

কিন্তু হুঁশিয়ার ছিলাম জিপকে নিয়ে। বুদ্ধিমান বাপ-মা মাত্রই ছেলেকে চোখে চোখে রাখে এমতাবস্থায়

একদিন জিজ্ঞেসও করেছিলাম, জিপ, ধর তোর সৈন্যগুলো জ্যান্ত হয়ে গিয়ে যদি কুচকাওয়াজ করতে আরম্ভ করে দেয়, কী করবি তখন?

করেই তো, ডালাটা খোলবার আগে শুধু ফুসমন্তরটা বলে দিই, সরলভাবে বলেছিল জিপ।

বাস? সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় কুচকাওয়াজ?

নইলে কি এত ভালোবাসতাম?

চমকে ওঠাটা স্বাভাবিক। উঠেছিলাম।

তারপর বেশ কয়েকবার জানান না দিয়ে হুট করে ঢুকে পড়েছিলাম ওর খেলাঘরে। দেখেছিলাম, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্যরা। কিন্তু ম্যাজিক আচরণ কারও মধ্যে দেখিনি ক্ষণেকের জন্যেও। টাকাকড়ির ব্যাপারটা এবার বলা যাক। দেনা মিটিয়ে দেওয়ার বদভ্যেসটা আমার মজ্জাগত। ম্যাজিক দোকানের খোঁজে রিজেন্ট স্ট্রিটে বহুবার হানা দিয়েছি, হতাশ হয়েছি প্রতিবারেই। তবে, দোকানদার যখন জিপের নাম-ঠিকানা জেনে বসে আছে, তখন আশা আছে, একদিন-না-একদিন বিলটা পৌঁছাবেই, দামটাও মিটিয়ে দেব। টাকাকড়ির ব্যাপারটা তাই ছেড়ে দিয়েছি ম্যাজিশিয়ান মহাশয়ের মর্জির ওপর।